কাপালী-বৌ ঃ

কাপালীদের ছোটবৌ বা কাপালী-বৌ এ উপন্যাসে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে এবং তাকে দিয়েই বিভূতিভূষণ কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন। তবে শুধুমাত্র কাহিনীর ব্যাপ্তিতেই নয়, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাপালী-বৌ এ উপন্যাসে অনঙ্গর মতই একটি স্বতন্ত্র চরিত্র। অনঙ্গর স্বাতন্ত্র্য তার নারীত্বের গৌরবে, দাম্পত্য প্রেমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এবং শুচিতায়। কিন্তু কাপালী-বৌয়ের দাম্পত্যজীবন অপূর্ণ, তথাকথিত সতীত্বের গরিমাও তার নেই। তবে নারীর রূপ-যৌবন তার আছে। ঢেঁকিশালার মেয়েলী আড্ডায় কাপালী-বৌকে আমরা প্রথম দেখলুম। বিভূতিভূষণ লিখছেন—'হরি কাপালীর ছোট বৌয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশি হবে, ছেলেপুলে হয়নি, রংও ফর্সা, মুখ-চোখের চটক ও দেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।' দৈহিক চাকচিক্যই শুধু নয়, ঢেঁকিতে পার দেবার মত ক্ষমতা তার আছে, কথাবাতাতেও বেশ চৌকস। ঢেঁকিঘরের মজলিশে যখন সকলে অনঙ্গর রূপের তারিফ করছিল, ছোটবৌ তখন বলেছে—'বামুন-বৌয়ের রাঙা পায়ের তলায় আমি মরতি পারি।'

বস্তুতপক্ষে অনঙ্গকে কাপালী-বৌ খুব ভালবাসতো, ব্রাহ্মণ বলেও তাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। আবার অনঙ্গর ভালবাসাও তার শ্রদ্ধা-ভালবাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাপালী-

বৌয়ের মধ্যে একটা প্রাণবন্ত হৃদয় ছিল। ভালোকে ভালবাসতে পারার মত তার একটা দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। তারই এই ক্ষমতা তাকে অতি বড় সংকটের মধ্যেও যেন পথনির্দেশ করেছে। কাপালী-বৌকে লেখক অধিকাংশ সময়েই অনঙ্গবৌয়ের কাছাকাছি রেখেছেন। সে না থাকলে অনঙ্গর সতীধর্ম যেন এতটা মহিমান্বিত হত না, সে না থাকলে হীনপতিতের প্রতি অনঙ্গর ভালবাসা যেন এমন করে পরিস্ফুট হত না। বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, কাপালী-বৌকে অবলম্বন করে অনঙ্গ-চরিত্রের বিকাশ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে।

এই সদানন্দময়ী মেয়েটিও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ল কিন্তু হতোদ্যম হল না। চাল কোথাও মেলে না। সে অনঙ্গর কাছে এক খুঁচি চাল ধার করতে গিয়ে দেখলো, তার বাড়িতেও চাল প্রায় বাড়ন্ত। সে মতি-মুচিনী আর অনঙ্গর সঙ্গে চললো জঙ্গলে মেটে আলু খুঁজতে। সেখানে গিয়ে এক বিপত্তি। একটা জোয়ান চেহারার লোক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে তেড়ে আসতে লাগলো। তার লক্ষ্য বিশেষ করে অনঙ্গ। অনঙ্গ খুব ভয় পেয়ে কাঁটাবনে ঢুকে গেল। মতি-মুচিনী লোকটাকে একটা জোর ধাক্কা দিতে সে আলুর গর্তে পড়ে গেল। সেই সময় কাপালী বৌয়ের হাত থেকে শাবলটা নিয়ে মতি রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়াল লোকটার সামনে। তাই দেখে লোকটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে এমন বিপদের মধ্যেও কাপালী-বৌ হি-হি-হি করে হাসতে লাগল। বাড়ি ফেরার পথে অনঙ্গ কাপালী-বৌকে উদ্দেশ করে বললে—'এই ছুঁড়ি, আজকের কথা ওইসব যেন কাউকে বলিস নে'— কাপালী-বৌ না বোঝার ভান করে বললে—'কোন্ কথা? মেটে আলুর কথা?' তারপর অনঙ্গর কাছে বকুনি খেয়ে আবার হি-হি-হি করে হাসতে লাগল। পরে হাসি থামিয়ে বললে—'পাগল বামুন-দিদি! তোমায় নিয়ে যখন কথা, তখন জেনো, কাগ-পক্ষিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-সূর্যি নেই?'

অনঙ্গর প্রতি এই ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার জন্যই কাপালী-বৌ পেটের জ্বালায় বিপথগামী হতে হতেও ফিরে এসেছে। কিন্তু খিদের কষ্ট যখন দুঃসহ, বিদ্রোহিনী হতে তার বাধেনি। যদু-পোড়ার প্রস্তাবকে সে উপেক্ষা না করে অনঙ্গকে বলেছে—'আর পারিনে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুনদি, পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো—'

নীচু জাতের এইসব বেপরোয়া মেয়েদের মধ্যে বিভূতিভূষণ যেমন দেখেছেন বিদ্রোহিনী নারীকে, তেমনি এরাই আবার শক্তিময়ী। সমাজজীবনের চিরাচরিত নিয়ম-কানুনকে অস্বীকার করে এরাই নতুন চেতনা, নতুন যুগের প্রবর্তনা করে। কাপালীবৌকে দেখে 'ইছামতী' উপন্যাসের নিস্তারিণীকে মনে পড়ে। সধবা নিস্তারিণীও কাপালী-বৌয়ের মত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। স্বামী-সোহাগে সে পরিতৃপ্ত নয়। বিভূতিভূষণ তার মধ্যে দিয়েও নবীন প্রাণের উচ্ছলতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে কোথাও লেখক অবৈধ প্রেমের নামে কামকলার নগ্নচিত্র আঁকেননি। নারীর এই প্রাণধর্মের প্রতি বিভূতিভূষণের একধরনের সশ্রদ্ধ স্নেহের ভাব ছিল। নিস্তারিণীরও কিছুটা দারিদ্র্য ছিল কিন্তু কাপালী-বৌয়ের মত এমন অসহ্য খিদের জ্বালায় জ্বলে তাকে বিভ্রান্ত হতে হয়নি। অভাবের জন্যই তার স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। এজন্য তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া যে স্বামী তাকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, তার জন্য দেহের শুচিতা রক্ষা করার গরজও বোধ হয় তার ছিল না। তবু এরা মমতাময়ী; নিস্তারিণী যেমন তিলুর প্রতি,

কাপালী-বৌ তেমনি অনঙ্গর প্রতি। কাপালী-বৌ সামান্য যে-কটি চালের জন্য নিজের দেহ বিক্রি করেছে, সেই চাল থেকেই অনঙ্গকে সে ভাগ দিতে চেয়ে বলেছে—'পায়ে পড়ি বামুন-দিদি। নাও দুটো চাল তুমি—' অনঙ্গর নিকট তিরস্কৃত হয়েও সে বলেছে—'তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই'—এ শুধু কাপালী-বৌয়ের কামনা নয়, এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ দুর্ভিক্ষপীড়িত সমস্ত অন্নহারা মানুষের কাতর হাহাকারকে ভাষা দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীও ঠিক এই ভাষাতেই তার সন্তানের জন্য অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার কাছে বর প্রার্থনা করেছিল।—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ আর এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—দু'শ বছরেও বাঙালীর অন্নকষ্ট দূর হল না!

দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্ষুধার ঊর্ধ্বেও তবু মানবতা বেঁচে থাকে। মধ্যবিত্ত মানুষ শত উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যকে বহন করে এগিয়ে যায়। অনঙ্গদের আহ্বানে কাপালী-বৌরা বিপথ থেকে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে তারা রক্ষা করতে পারে কিনা জানা যায় না; তবু চেষ্টা করে। কাপালী-বৌও চেষ্টা করেছে। কারণ তার মধ্যে সেই শুভ চেতনা কিছুটা বেঁচে ছিল। সেইজন্য সে দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং গঙ্গাচরণের সঙ্গে মতি-মুচিনীর শবযাত্রায় অংশ নিয়েছে। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা তার সব পাপ ধুয়ে দিয়ে তাকে পবিত্র ও স্মরণীয় করে রেখেছে। সতীত্ব অপেক্ষা নারীর নারীত্ব বড়—শরৎ সাহিত্যের এই প্রচলিত সংস্কারকেই বিভূতিভূষণ কাপালী-বৌয়ের চরিত্রে পরিস্ফুট করেছেন।